প্রবন্ধ

আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন (১৯৪২-৭৮ খৃঃ)

*মুহাম্মাদ মাহফুযুর রহমান**

আধুনিক বিশ্বের এক বিরাট অংশ জুড়ে প্রায় অর্ধশত মুসলিম রাষ্ট্র সভ্য রাষ্ট্রসভার সদস্য হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সতেজ চেহারার কাছে মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র আজ বিবর্ণ। রক্তক্ষয়, হত্যা, ধর্ষণ ও সীমাহীন নিপীড়নের মুখে মুসলমানদের জীবন ও অস্তিত্ব এখন হুমকির সম্মুখীন। বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন এবং ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলিম বিশ্ব আজ এক কঠিন অধ্যায় অতিক্রম করছে। ইসলামের কথা বলা কিংবা মুসলিম হিসাবে পরিচয় দান করাই যেন চরম অপরাধ। ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু এমনকি মুসলিম পরিচয়ধারী মুনাফিক্ব গোষ্ঠীও ইসলামের সুমহান আদর্শকে ধ্বংস করতে দৃঢ় শপথে ঐক্যবদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিম ট্রাজেডি যেন প্রতিদিনের বাধ্যতামূলক সংবাদ। ফিলিস্তীনে চলছে তিন যুগের অধিককাল ধরে ইহুদীবাদের নারকীয় তাণ্ডবতা। বসনিয়ায় চলেছে সভ্যতার সবচেয়ে জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংস এবং নারী ধর্ষণের উন্মত্ততা। কাশ্মীরসহ গোটা ভারতে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তীন, ফিলিপাইনের মরো ও কাশ্মীরের মত আরাকানের মুসলমান সমস্যাও মুসলিম জাহান এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান ট্রাজেডি। পৃথিবীর প্রচার মিডিয়ার আড়ালে একান্ত নিভৃতে বৌদ্ধবাদী সামরিক শাসক ও মগদের অমানবিক নির্যাতনে সেখানকার মুসলিম জাতিসত্তা বিলীন হবার পথে। নির্যাতিত মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আরাকানী মুসলমানদের অবস্থা (১৯৪২-৭৮ খৃঃ) বর্ণনা করাই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

আরাকানে মুসলিম প্রভাবঃ

বর্তমানে মিয়ানমার রাষ্ট্রের অন্তর্গত 'রাখাইন ষ্টেট' নামে পরিচিত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী একটি প্রদেশের নাম আরাকান। সেখানকার অধিকাংশ মুসলমান রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। বর্তমানে তাদের অবস্থা আরাকানে যেমন সংকটপূর্ণ, তেমনি বাংলাদেশের জন্যও বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যার সূচনা মূলতঃ ১৯৪২ সাল থেকে। তারপর থেকে বিভিন্ন সময় স্থানীয় মগদের নির্যাতনের প্রেক্ষিতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিজস্ব বসতবাড়ী ছেড়ে বাংলায় চলে আসে।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজা মহৎ-ইঙ্গ-চন্দ্রের (৭৮৮-৮১০ খৃঃ) রাজত্বকালে আরবীয় মুসলিম বণিকগণ নৌবহর নিয়ে আরাকানের আকিয়াব বন্দরসহ দক্ষিণ-পূর্ব চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচারের জন্য চলে আসেন। এ সময় একটি আরবীয় বাণিজ্য বহর রাহাম্বী দ্বীপের পাশে বিধ্বস্ত হয় এবং স্থানীয় জনগণ তাঁদের উদ্ধার করে। আরাকানরাজ তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণ লক্ষ্য করে সেখানেই বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন।[১]

দশম ও একাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বণিকদের পাশাপাশি বদরুদ্দীন (বদরশাহ)[২] সহ অনেক অলি-আউলিয়া ইসলাম প্রচারের জন্য আরাকানে আসেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের ঔদার্য ও মহানুভবতা প্রচার করেন। এ সময় আরাকানে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৩] সে সময় মুসলমানগণ এতটা জনপ্রিয় ছিল যে, তারা বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি ইসলামের সুমহান ঔদার্য রাজশক্তি ব্যতীত সকল স্তরকেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।[৪]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে চন্দ্র-সূর্য বংশের রাজা অযুথুর পুত্র নরমিখলা স্বীয় চাচাকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে। অতঃপর ক্ষমতাচ্যুত আরাকান রাজার আমন্ত্রণে বার্মার রাজা মেং শো আই (Meng Show Wai 1401-22) ১৪০৬ সালে ৩০ হাযার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করলে নরমিখলা প্রাণ ভয়ে গৌড়ে এসে আশ্রয় নেন এবং ১৪৩০ সালে বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ সেনাপতি ওয়ালী খানের নেতৃত্বে ২০ হাযার সৈন্য দিয়ে তাঁর স্বদেশভূমি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন। ওয়ালী খান রাজ্য জয় করে নিজেকেই আরাকানের স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা দেন। নরমিখলা পুনরায় গৌড়ে পালিয়ে এলে পরের বছর সিন্ধি খানের নেতৃত্বে আবারো ৩০ হাযার সৈন্য পাঠিয়ে তাঁর স্বদেশভূমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। নরমিখলা পিতৃভূমি উদ্ধারের পর লঙ্গিয়েত থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে লেম্ব্রু নদীর তীরে ম্রোহং নামক শহরে স্থাপন পূর্বক রাজ্য শাসন করতে থাকেন। বাংলা থেকে আগত দু'পর্বে প্রায় ৫০ হাযার গৌড়ীয় সৈন্য আর স্বদেশে ফিরে না এসে আরাকানেই স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে।[৫]

---

* পি,এইচ-ডি গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান, তাওয়ারিখে ইসলামঃ বার্মা ওয়া আরাকান (কলিকাতাঃ দি ষ্টার আর্ট প্রেস, ১৯৪২), পৃঃ ২৪; আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি (চট্টগ্রামঃ জোবাইদা বানু চৌধুরী, ১৯৮০), পৃঃ ১০১; R.B. Smart, Burma Gazetteer Akyab District, Vol. A (Rangoon: Burma Government Printing & Stay, 1959), p. 17.

২. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খন্ড (ঢাকাঃ বর্ণ মিছিল, ১৯৭৮), পৃঃ ৮৪৮।

৩. মাইন্ট আং, ইমদাদুল হক সরকার অনূদিত, বার্মায় ইসলাম, দৈনিক আজাদ, ২৩ জানুঃ ১৯৮৭।

৪. শাহ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, বার্মার রোহিঙ্গা মুসলমান, দৈনিক ইনকিলাব, ২০ এপ্রিল, ১৯৯০।

৫. Smart, Burma Gazetteer, p. 7.

www.WaytoJannah.Com

নরমিখলা প্রথমতঃ স্বীয় রাজধানী সুরক্ষিত করার মানসে তার রাজধানীর পূর্ব-দক্ষিণে সেনা ছাউনি তৈরী করে সৈনিকদের অনেককেই পুনর্বাসন করেন এবং গৌড়ীয় স্থাপত্যরীতিতে সন্দিকান বা সিদ্ধিখান মসজিদ নির্মাণ করেন।[৬] পরবর্তীকালে তাদের বংশ বিস্তারের ফলে সেখানকার রওয়ানা, নেদানপাড়া, মোয়াল্লেমপাড়া, সাম্পুরিক, কুয়িপাড়া, কামারপাড়া প্রভৃতি মুসলমান জনপদ গড়ে উঠেছিল। এ সব এলাকায় সাতটি পাকা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান।[৭]

দ্বিতীয়তঃ বার্মা রাজ্যের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ আরাকানের স্যান্ডুয়ে (চাঁদা ও চকপেয় কেপ্র) সীমান্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সেখানে বাংলা থেকে আগত সেনাদের জন্য দু'টি সেনানিবাস স্থাপন করেন। তারাও মগরমণী বিয়ে করে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। তাদের বংশ বিস্তারের ফলে পরবর্তীকালে স্যান্ডুয়ের শুয়েজুবি, চানবি, নাজবি, জাদি, পেরাং, চাংদয়ক, থাডে, ছায়াডো, সিবিন ও চকপিয়ুর চৌকনেমু, ছনে, জালিয়াপাড়া, মেহেরবণু প্রভৃতি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল। এ জনপদগুলি কালাপাঞ্চন, কোয়ালং, গৌলংগী নামে খ্যাত।[৮]

এছাড়া নরমিখলা আরাকান জয়ের পর চট্টগ্রাম থেকে অনেক মুসলমান সেখানে গিয়ে স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে অনাবাদী অঞ্চলে স্থায়ী আবাস গড়ে কৃষি কাজ শুরু করেছিল।[৯] তাছাড়া ১৫৭৫-৭৬ সালে গৌড় ধ্বংস কালে বাংলার কিছুসংখ্যক মুসলমান চক্রশালা হয়ে ম্রোহং-য়ে উপস্থিত হয়; যাদের মধ্যে কররাণী সুলতানের আমীর-ওমারা প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁরা সেখানে যথাযথ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।[১০]

সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পর নরমিখলা চার বছর (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। এ সময় থেকে আরাকানরাজ নরমিখলা বাংলার সুলতানদের মত তাঁদের মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় ফারসী অক্ষরে কালেমা ও মুসলমানী নাম লেখার রীতি চালু করেন। তাঁর পরবর্তী রাজাগণ বাংলার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েও মুদ্রার এক পৃষ্ঠে ফারসী অক্ষরে কালেমা ও বৌদ্ধ নামের সঙ্গে মুসলমানী নাম ব্যবহার করতেন।[১১] ১৪৩০-১৬৪৫ সাল পর্যন্ত দু'শ পনের বছর যাবৎ স্বাধীন আরাকানের রাজাগণ তাঁদের মুদ্রায় মুসলমানী নাম ব্যবহার করলেও এ দীর্ঘ সময় বাংলার মুসলমান শাসকদের সাথে তাদের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। অথচ তারা দেশে মুসলমানী রীতি-নীতি ও আচার-পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে মেনে আসছিল। কারণ আরাকান রাজাগণ তাঁদের নিজস্ব সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার ব্যবহারের চেয়ে মুসলমানদের সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার ব্যবহার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত হিসাবে পেয়েছিল। বাংলার মুসলমান রাজশক্তির সাথে তাঁদের বিরোধ থাকলেও মুসলমান জাতির প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ছিল না। তাই তাঁদের সৈন্যবিভাগের প্রধান সেনাপতি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক বিশিষ্ট বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদ পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন।[১২]

ম্রাউক-উ-রাজবংশের রাজাগণ ১৪৩০-১৭৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ৩৫৫ বছরকাল আরাকানে রাজত্ব করেন।[১৩] এ রাজবংশ ছিল আরাকানের জন্য বিশেষতঃ আরাকানী মুসলমানদের জন্য আশির্বাদ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ম্রাউক-উ-রাজবংশ বিশেষ করে ১৪৩০ থেকে ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ২৫৪ (দু'শ চুয়ান্ন) বছরের শাসনামলে শাসকদের প্রজ্ঞাও যেমন ছিল, তেমনি ছিল ইসলাম প্রিয়তা। তাঁরা বাঙ্গালী, আরবীয়, ইরানী, কিংবা আরাকানী মুসলমানকে প্রধানমন্ত্রী, সৈন্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, কাযী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দান করে রাজ্যের উন্নতি বিধানে তৎপর ছিলেন।[১৪] ফলে রাজনীতি, সমরনীতি, দরবারের আদব-কায়দায় ইসলামী রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হ'ত। তাছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনেও ইসলামী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেখানে যে পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয়, তা খাঁটি আরবীয় মুসলমানদের সংশ্রবের ফল।[১৫] নৌবিদ্যায় প্রাচীনকালে আরবীয় মুসলমান বণিকগণ দক্ষ ছিলেন। তাঁদের সংশ্রবে সেখানকার মুসলমানরাও নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে।[১৬] এ এলাকার বিভিন্ন জায়গার আরবী নাম, কাব্যরীতিতে আরবী ভাষার প্রয়োগ এসবই ইসলামী প্রভাব প্রসূত।[১৭]

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম অমাত্যবর্গের অনন্য ভূমিকা ছাড়াও তাদের আর একটি বড় অবদান হ'ল, তারা মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদেরকে পৃষ্টপোষকতা দিয়ে বাংলা

৬. *আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃঃ ২০৯-৫৪।*
৭. *মাহবুব-উল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল (চট্টগ্রামঃ নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃঃ ৫৫-৫৭।*
৮. *তদেব।*
৯. *M.S. Collis, Arakan's place in the civilization of the Bay, JBRS, 50th Anniversary publication, No. 2, Rangoon, 1960, p. 486.*
১০. *আহমদ শরীফ, সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৩৭৯ বাং), পৃঃ ৩৪।*
১১. *M.S. Collis, Arakan's place in the civilization of the Bay, p. 491.*
১২. *মুহাম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য, মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃঃ ৩৬; মাহবুব উল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পৃঃ ৫৪-৫৭।*
১৩. *Harvey, History of Burma: From the Earliest Time to 10 March 1824, The Begining of the English Conquest (London: Frank Cass & Co., 1967), pp. 137-49.*
১৪. *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য, পৃঃ ৩৬; মাহবুব উল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পৃঃ ৫৪-৫৭; Yunus, A History of Arakan: Past & Present (Chittagong: Magenda Color, 1994), pp. 35-36.*
১৫. *অমৃতলাল বালা, আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃঃ ৬৭।*
১৬. *তদেব, পৃঃ ৬৮।* ১৭. *তদেব।*

www.WaytoJannah.com

সাহিত্যের ভিত্তিমূল শক্ত করেছিলেন। মূলতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম প্রভাবিত আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবিদের হাতেই বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হচ্ছিল; যার ফলাফল বহুমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।[১৮]

প্রাচীন যুগের হিন্দু কবিরা সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আরাকান রাজ দরবারে আশ্রিত মুসলমান কবিরা কেবল সংস্কৃত নয়, হিন্দী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি উন্নত ভাষা-সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেন; তেমনি তাঁরা নিজস্ব বিশ্বাস ও চেতনার উপর ভিত্তি করে পুঁথি সাহিত্য রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষার ভিত্তিকে মযবূত করেছেন। তাঁরাই বাংলা সাহিত্যে মানবীয় প্রেমকে কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে পরিকল্পনা করে সাহিত্য রচনার পথিকৃৎ।[১৯] আরাকানের মুসলিম কবিগণ বাংলা সাহিত্যকে বিষয় বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ করে ভারতীয় উন্নততর হিন্দী ভাষার সাথে যুক্ত করেন এবং নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সুমধুর ফারসী সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে নানাভাবে সম্প্রসারিত করেছেন।[২০] আরাকান রাজসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয় তার তুলনা আর কোথাও মেলে না।[২১] কবিরা যেমন ছিলেন ধার্মিক মুসলমান, তেমনি তাঁদের পৃষ্টপোষক, আশ্রয়দাতা ও আদেশ দাতারাও (রাজার অমাত্যবর্গ) ছিলেন একই পথের পথিক। তাঁদের কার্যরীতির ভাষা ছিল আরবী-ফার্সী।[২২]

আরাকান হিন্দু-মুসলিম ও বৌদ্ধ জাতিগোষ্ঠীর মিলন কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হ'লেও ইসলাম তাদের উপর এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, এ বিচিত্র সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হয়েও তারা সব রকমের দ্বন্দ্ব-কলহ ও জাতি বৈরীকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল। ইসলামের শান্তির বাণী তাদের এ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল।[২৩] ফলে আরাকানের মুসলিম কবিগোষ্ঠীর কাব্যাদর্শ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষের উপাদেয় সামগ্রী হ'তে পেরেছিল। কিন্তু আরাকান রাজ্যের বিশৃংখলা ও মুসলমানদের ক্ষমতা হ্রাসের কারণে সপ্তদশ শতাব্দী শেষ না হ'তেই আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা কমে যায়।[২৪]

মোগল সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে বাংলার মোগল সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মাদ সুজা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সাথে পরাজিত হয়ে ১৬৬০ সালের ২৬ আগষ্ট আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-য়ে পলায়ন করে আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার দরবারে আশ্রয় নেন এবং এক পর্যায়ে সেখানেই স্বপরিবারে নিহত হন। তাঁর অনুচরবর্গ আরাকানেই থেকে যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানকে নির্দেশ দেন। তিনি ১৬৬৬ সালে আরাকানী বাহিনী ও মগ জলদস্যুদের পরাজিত করে সমগ্র চট্টগ্রাম দখল করেন।[২৫] অতঃপর ১৬৮৪ সালে আরাকানরাজ সান্দা থু ধম্মার মৃত্যুর পর থেকে ক্রমশঃ আরাকানের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বিশেষতঃ ১৭১০ সালে সান্দা উইজ্যা আরাকানের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সামন্তদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে আরাকানরাজ ক্রমশঃ শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজ্যের স্থিতিশীলতাও বিনষ্ট হ'তে থাকে। সামন্তদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজ্যে স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবার সুযোগে বর্মীরাজ বোধপায়া ১৭৮৫ সালে আরাকান দখল করেন।[২৬] ১৮২৩ সালে ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের পর আরাকান কোম্পানীর শাসনাধীনে এলে সেখানে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে এবং আরাকান থেকে পালিয়ে আসা আরাকানীদের অধিকাংশই পুনরায় স্বদেশে ফিরে যায়।

এছাড়া কোম্পানী ও বৃটিশ শাসনামলে আরাকান ও বার্মা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে এলে বাংলা এবং ভারতের অনেক মুসলমান ব্যবসা ও চাকরির উদ্দেশ্যে আকিয়াব, রেঙ্গুনসহ বিভিন্ন শহরে গমন করে। অধিকাংশ লোক কাজ শেষে স্বদেশে ফিরলেও কেউ কেউ সেখানেই স্থায়ী আবাসন গড়ে বসবাস করতে থাকে। এভাবে অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে সময়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আরাকানে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে এবং এটি পুরোপুরিভাবে মুসলিম প্রভাবিত এলাকায় পরিণত হয়।[২৭]

রোহিঙ্গা নির্যাতন (১৯৪২-৭৮ খৃঃ)ঃ

রোহিঙ্গারা ১৯৪২ সালের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানে দু'একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়া ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিল এবং সেখানকার মগ সম্প্রদায়ের সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে, স্থানীয় মগরা ইয়োমা পাহাড়ের উচ্চশৃংগের অপর পাড়ের বৌদ্ধদের চেয়ে প্রতিবেশী রোহিঙ্গাদেরকে বেশি আপন মনে করত।[২৮] কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে গোটা উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের

---

১৮. তদেব।
১৯. আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য, পৃঃ ৯৬-৯৭।
২০. তদেব। ২১. তদেব।
২২. আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পৃঃ ৬৮।
২৩. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খন্ড (কলিকাতাঃ ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃঃ ৫৪৮।
২৪. তদেব।

২৫. M. Siddiq Khan, The Tragedy of Mrauk-U-(1660-1666). JASP, vol. XI, No. 2, August 1966, p. 198.
২৬. রতন লাল চক্রবর্তী, বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক, ১৭৮৫-১৮২৪ (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪), পৃঃ ৯; আবদুল মাবুদ খান, চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস ঃ প্রচলিত কথা, ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৫শ ও ২০বর্ষ সম্মিলিত সংখ্যা, বাংলা ১৩৮৮ ও চৈত্র ১৩৯৩, পৃঃ ৮৯।
২৭. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪৪৪-৪৫; মাহবুবুল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল (চট্টগ্রামঃ নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃঃ ৭২।
২৮. সামিউল আহমদ খান, রোহিঙ্গা মুসলমান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ২৩ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃঃ ২২৬।

www.WaytoJannah.Com

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

সুবাদে বার্মায় থাকিন পার্টির (Thakin Party)[২৯] নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হ'লে পার্টির নেতৃবৃন্দ আরাকানের মগ নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক গড়ে মুসলমান-মগদের মাঝে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা উত্তর আরাকানকে বর্মীভুক্ত রাখার পরিকল্পনা করে। তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মগদের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে।[৩০] ১৯৩৭ সালে বৃটিশ-ভারত থেকে বৃটিশ বার্মা আলাদা হবার পর বৃটিশ প্রশাসন Home Rule (Local Self Government of 1937) জারি করে বার্মায় অভ্যন্তরীণ স্থানীয় সরকার গঠনের বিষয় অনুমোদনের মাধ্যমে বর্মী নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানী দিয়ে ১৯৩৮ সালে রেঙ্গুনসহ বার্মার নীচু অংশে (Lower Burma) মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে ৩০,০০০ মুসলমানকে হত্যা করে।[৩১] এ সূত্র ধরে ১৯৪০ সালে মুসলমানদের উপর বৌদ্ধ ধর্ম ও এর প্রচারক গৌতম বুদ্ধের অবমাননার অভিযোগ এনে Do Bama Asciayone বা 'থাকিন পার্টি' নামে বর্মী জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী দল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করে; যার পরিণতি হিসাবেই ১৯৪২ সালে আরাকানে মুসলিম নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হয়।[৩২]

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'লে 'থাকিন পার্টি'র নেতৃবৃন্দ বার্মার স্বাধীনতার অঙ্গীকার না দেওয়া পর্যন্ত বৃটিশকে সমর্থন না দেবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানালে বৃটিশ সরকার অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাকে গ্রেফতার করে। এ সময় অং সান (Aung San)-এর নেতৃত্বে ত্রিশ সদস্যের একটি দল গোপনে জাপানে পালিয়ে গেলে জাপান সরকার এদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেন এবং জাপানের অর্থ, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব তত্ত্বাবধানে Burma Independent Army (BIA) গঠিত হয়।[৩৩] ১৯৪১ সালে জাপানী বাহিনীর সাথে BIA বার্মায় প্রবেশ করে এবং ১৯৪১ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাপানীদের কাছে রেঙ্গুনের পতন ঘটলে BIA-এর শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ জাপানী বিমানবাহিনী আকিয়াবের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করার ফলে অনেক বৃটিশ, গুর্খা (Gorkha), রাজপুত (Rajput) এবং কারেন (Karen) সৈন্য নিহত হয়।[৩৪] জাপানীদের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে বৃটিশ শক্তি আরাকান ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে আরাকানে এক প্রশাসনিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ সময় BIA-এর কিছু সদস্য জাপানী সেনাবাহিনীর সাথে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে আরাকানে এলে স্থানীয় মগরা BIA-এর সহযোগিতায় আরাকানের নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর অস্ত্র-সস্ত্র হস্তগত করে আকিয়াব, রাছিডং ক্যাকথ, মাব্রা, মিনবিয়া, পুনাজুয়ে, বাহারপাড়া, মহামুনী পাকটুলিসহ গোটা আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়, যা '৪২ মাস্যাকার' হিসাবে কুখ্যাত।[৩৫] নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা, লুটতরাজ, নারী ধর্ষণসহ গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি, উন্মত্ত হামলাকারীরা মৃত মানুষের মস্তক বর্ষার মাথায় বিঁধে তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে বিজয়ানন্দ উদযাপন করেছে।[৩৬]

আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লাখ লাখ লোক দুর্গম 'আপক' গিরিপথ দিয়ে উত্তর আরাকানের মংডু, বুচিদং এলাকায় পলায়ন করার সময় পথিমধ্যে হাযার হাযার লোক মৃত্যুবরণ করে। নাফ নদী ছিল নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বনিতাসহ অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলমানের লাশে পরিপূর্ণ।[৩৭] এ হত্যাকাণ্ডে প্রায় ১ লাখ রোহিঙ্গাকে হত্যা এবং প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গাকে বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা হয়। অনেকে সঊদী আরব, পাকিস্তান, ভারত, ইরান, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও পার্শ্ববর্তী দেশসহ বাংলার বিভিন্নস্থানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।[৩৮] বৃটিশ সরকার রংপুরের সুবীর নগরে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করেছিল। উত্তর আরাকান হ'তে বহু দূরে রংপুরের সুবীর নগরে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল।[৩৯] কক্সবাজারের স্থানীয় প্রশাসন সমুদ্রের উপকূলবর্তী একটি এলাকার বহু উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন করেছিল; যা এখনও 'রিফিউজি ঘোনা' নামে পরিচিত। দেশ স্বাধীন হ'লেও বার্মা সরকার এ সমস্ত উদ্বাস্তুদের আর স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়নি।[৪০]

রোহিঙ্গারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী হ'লেও আকিয়াবসহ আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের অনেকেই প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ছিল। কেউ কেউ আবার ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য

---

২৯. *থাকিন (THAKIN) শব্দের অর্থ মালিক। ১৯৩০ সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্র DOHBAME ASIAYONE বা We Burmese Association নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনের কর্মীরা নামের প্রথমে থাকিন শব্দটি লিখত বলে জনসাধারণের কাছে এটি 'থাকিন পার্টি' নামে পরিচিত হয়। দ্রঃ এন.এম. হাবিব উল্লাহ, রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫), পৃঃ ১০৬।*

৩০. *আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পৃঃ ১৪৬-১৪৭।*

৩১. *মোঃ মাইমুল আহসান খান, মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থীঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (ঢাকাঃ বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮), পৃঃ ৪০; আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পৃঃ ১৪৭।*

৩২. *বার্মার মুসলমান মুহাম্মদ রুহুল আমিন অনূদিত, তেহরান টাইমস, ২৪ মে ১৯৮৩-এর সৌজন্যে, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ২৩ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃঃ ২১৭।*

৩৩. *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পৃঃ ১০৬।*

৩৪. *Mohammed Yunus, A History of Arakan: Past and Present, p. 105.*

৩৫. *আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পৃঃ ১৪৭; অচিন সাঁই, আরশী নগর, দৈনিক জনতা, ২৭ নভেম্বর ১৯৯১; মোঃ শাহেদ হুসেইন, আরাকানঃ আরেক কাশ্মীর, দৈনিক সংগ্রাম, ২২ নভেম্বর, ১৯৯১।*

৩৬. *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পৃঃ ১০৭।*

৩৭. *তদেব।*

৩৮. *Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan, Muslim Communities of South-East Asia: A Brif Survey (Chittatgong: Islamic Cultural Centre, 1980) p. 54; Abdur Razzaq and Mahfuzul Haque, A Tale of Refugees Rohingyas in Bangladesh (Dhaka: The Centre for Human Rights, 1995) pp. 15-16.*

৩৯. *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পৃঃ ১০৭।*

৪০. *তদেব।*

www.WaytoJannah.com

করেও জীবন যাপন করত। জেনারেল নে উইন ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশের ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্রীয়করণ করলে রোহিঙ্গা ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ বিভিন্ন ইস্যুতে মগদের অত্যাচার ও লুটপাটের কারণে আতংকিত ব্যবসায়ীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন শুরু করে। জেনারেল নে ইউন Burmese Way to Socialism কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম, বর্মী জাতীয়তাবাদ ও মার্কসবাদের একটি অদ্ভুত মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দেশের অর্থনীতিকেও মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেন।[৪১] ১৯৬০ সালে বার্মার মাথাপিছু আয় যেখানে ৬৭০ ডলার ছিল, পরবর্তীতে তাঁর এ নতুন ব্যবস্থার কারণেই ২০০ ডলারে নেমে আসে।[৪২]

জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই রোহিঙ্গা নির্মূলের জন্য আরাকানী মগদের উস্কিয়ে দেয়। ১৯৬৪ সালে রোহিঙ্গাদের Rohingya Organization,[৪৩] The Rohingya Youth Organization,[৪৪] Rangoon University Rohingya Students Association,[৪৫] Rohingya Jamiatul Ulama,[৪৬] Arakan National Muslim Organization,[৪৭] Arakanese Muslim Youth Organization,[৪৮] এবং Rohingya Student Association[৪৯] প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ নিষিদ্ধ করেন[৫০] এবং ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে Burma Broadcasting Service (BBS) থেকে নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দেন।[৫১] অতঃপর ১৯৬৬ সালে সমস্ত বেসরকারি সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৫২]

নে উইন-এর শাসনামলে কয়েকবার মুদ্রা অচল ঘোষণার ফলে মুসলমানদের জন্য এক শাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালের ১৭ মে ৫০ ও ১০০ টাকার মুদ্রামূল্য রহিত করা হ'লে আরাকানী রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরাকানী মগরা নিজেদের মধ্যকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও স্থানীয় BSPP-এর সদস্য থাকার সুবাদে জমাকৃত অর্থের মূল্যমান নতুন টাকা ফেরৎ পেলেও রোহিঙ্গারা তাদের ডিপোজিটকৃত টাকা ফেরৎ পায়নি।[৫৩] পক্ষান্তরে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেশন বিতরণের সার্বিক তদারকী মগদের হাতে থাকায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে।[৫৪] উপরন্তু ১৯৬৭ সালে বার্মায় বিশেষতঃ রাজধানী রেংগুনে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে আরাকান থেকে চাল আমদানী করে রেংগুনে পাঠানো হয়। সরকারিভাবে রোহিঙ্গাদের মজুদকৃত খাদ্যশস্য জোরপূর্বক আদায় করে এবং সামরিক আধাসামরিক বাহিনীর লুটপাটের মাধ্যমে তাদের গোলা শূন্য করে দেওয়া হয়। একদিকে অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, খাদ্যশস্য লুট, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ এবং মুদ্রা অচল ঘোষণায় অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে যাত্রা; অন্যদিকে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিয়ে সরকারিভাবে নির্যাতন চালায়। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গাদের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।[৫৫]

রোহিঙ্গা নির্যাতনের অধ্যায় মূলতঃ ১৯৪২ সাল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে চরম আকার ধারণ করে। এখানে ১৯৪২-৭৮ পর্যন্ত নির্যাতনের কিছু খতিয়ান উপস্থাপন করা হ'ল।

বর্মী সরকার পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৪টি বড় রকমের অপারেশন চালিয়ে মানবাধিকার লংঘনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে।[৫৬] নিম্নে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রধান প্রধান ১১টি অপারেশনের বিবরণ সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হ'ল-[৫৭]

---

৪১. তদেব।

৪২. তদেব।

৪৩. এটি ১৯৫০ সালে আরাকানের মংডু শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শামসুল আলম চৌধুরী এবং মাষ্টার বদিউর রহমান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সংগঠনটি ১৯৬৪ সালে নে উইন কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। [আশরাফ আলম, আরাকান হিষ্ট্রিক্যাল সোসাইটি, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রাপ্ত।]

৪৪. ছাত্র-যুব সমাজের মাঝে ইসলামী চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য ১৯৫৬ সালে রেঙ্গুনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আবদুল মান্নান (U Tin Win) এবং রশীদ বা মং (Rashid Ba Maung) যথাক্রমে এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব।]

৪৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের রোহিঙ্গা ছাত্রদের মাঝে ইসলামী চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে ব্রহাম্মদ হুসাইন কাসিম এবং ব্রহাম্মদ খান দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব।]

৪৬. রোহিঙ্গাদের মধ্যকার আলিম সমাজকে একতাবদ্ধ করার জন্য এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবদুল কুদ্দুস এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব।]

৪৭. সুবহান উকিলের নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। [তদেব।]

৪৮. আরাকানের মুসলিম যুব সমাজকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে নৈতিকতা গঠনের নিমিত্তে ব্রহাম্মদ কাসিম (Nata Kasim) ও মং মং গিয়াই (Maung Maung Gyi) এর নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। [তদেব।]

৪৯. রোহিঙ্গা ছাত্রদের মাঝে দ্বীনী চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে শাহ্ আলম ও শাহ্ লতীফ-এর নেতৃত্বে রেঙ্গুনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরোল্লেখিত সংগঠনসমূহ ১৯৬৪ সালে নে উইন কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। [তদেব।]

৫০. A History of Arakan, pp. 149-50.

৫১. Ibid.

৫২. National Refugee Week, The Refugee Council of Australia, 17 June, 1992, p. 37.

৫৩. A History of Arakan, pp. 50-51.

৫৪. Ibid.

৫৫. Ibid.

৫৬. মুহাম্মাদ তাহের জামাল নদভী, সারযমীন আরাকান কি তাহরীকে আযাদী তারীখী পাচ মানযার মে (চট্টগ্রামঃ আরাকান হিষ্ট্রিক্যাল সোসাইটি, ১৯৯৯), পৃঃ ৩১৮; Insaf, Rohingyas Voice & Vision, vol. 3, Issue 3-4, 30 September, 1986, Arakan, Burma, p. 7.

৫৭. Ibid.

www.WaytoJannah.Com

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

আরাকানে রোহিঙ্গা বিরোধী সশস্ত্র অপারেশনঃ

অপারেশনের নাম	অপারেশনের এলাকা	সাল
বিটিএফ অপারেশন (Burma Territoria Force Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৪৮
কমবাইন্ড ইমিগ্রেশন এণ্ড আর্মি (Combined Immigration & Army)	উত্তর আরাকান	১৯৫৫
ইউ,এম,পি, অপারেশন (Union Military Police Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৫৫-৫৯
ক্যাপ্টেন টিন ক্যাইউ অপারেশন (Captain Htin Kyaw Operation)	বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা	১৯৫৯
শিউ কাই অপারেশন (Shwe Kyi Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬
কাই গান অপারেশন (Kyi Gan Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬
নাগাজিন কা অপারেশন (Nagazin Ka Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৭-৬৮
মাইয়াট মন অপারেশন (Myat Mon Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৯-৭১
মেজর অং থান অপারেশন (Major Aung Than Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৭৩
সেব অপারেশন (Sabe Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৭৪
নাগামিন (ড্রাগন) অপারেশন (Nagamin (Dragon) Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৭৮

সারণিতে উল্লেখিত অপারেশনসমূহ বাহ্যিকভাবে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নামে পরিচালিত হ'লেও তা মূলতঃ রোহিঙ্গা উৎখাতেরই নীলনকশা। উল্লেখিত ১১টি অপারেশনের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল বিটিএফ, শিউ কাই, কাই গান, মেজর অং থান, সেব (Sabe) এবং ড্রাগন অপারেশন। এ অপারেশনসমূহ পরিচালনা করে সরকারি পরিকল্পনার ভিত্তিতে হাযার হাযার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হয়।

Nagamin Operation-এর পর ১৯৭৯ ও ১৯৯২ সালে আরো কয়েকটি মারাত্মক অপারেশন পরিচালনা করে লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের অনেকেই স্বদেশে ফেরৎ গেলেও হাযার হাযার রোহিঙ্গা বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবির কিংবা তার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়ে বাংলাদেশেই থেকে যায়।[৫৮]

বার্মা সরকার ১৯৭৪ সালে BSPP-এর নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য First Peoples Congress (Pyethu Hlutn Taw) আহ্বান করে আরাকানকে শুধুমাত্র 'বৌদ্ধ শাসিত ষ্টেট' ঘোষণা করলে স্বৈরশাসকের ছত্রছায়ায় মগরা আরো উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে এবং আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে অনবরত রোহিঙ্গা মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম নিধন শুরু করে।[৫৯]

শুধু অপারেশন বা দাঙ্গা বাঁধানোই নয়, এছাড়াও বর্মী কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা নির্মূলে আরো বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর ব্যাপকভাবে উচ্চ হারে করারোপ করে এবং আরোপিত কর পরিশোধ করতে না পারলে তাদের বসতবাড়ী ঘেরাও করে জীবিকার জন্য মজুদকৃত খাদ্য-শস্যাদি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অজুহাতে অনেক অস্থাবর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সাথে বর্মী সরকার ওয়াক্‌ফকৃত জমি ও সম্পত্তি বেআইনীভাবে ভিত্তিহীন অজুহাতে ছিনিয়ে নেয়। আরাকানে জনসংখ্যাগত অবস্থান পরিবর্তন এবং রোহিঙ্গাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য তাদের বাজেয়াপ্তকৃত ভূমিতে নতুন নতুন মগ বসতি স্থাপন করে।[৬০]

রোহিঙ্গাদের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সরকারি অনুমতি ব্যতীত তারা এক থানা থেকে অন্য থানায় যেতে পারে না।[৬১] অপরদিকে বিনা মজুরীতে জবরদস্তিমূলক শ্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন শত শত রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও যুবকদেরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি ও নিরাপত্তা বাহিনীর কাজে দিনের পর দিন খাটানো হয়। শ্রমের মূল্য দাবী করলে কিংবা শ্রমদানে অস্বীকৃতি জানালে অমানবিক নির্যাতন অথবা মৃত্যুকেই সহজে মেনে নিতে হয়। রোহিঙ্গাদের উপর সেনাবাহিনী ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার জন্য নিয়মিত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা অনেকটা বাধ্যতামূলক।[৬২]

রোহিঙ্গাদের জীবন ও সম্পদই শুধু নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহও বর্মী সরকারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বুচিদং শহরের বাজার মসজিদ, রাহাস্ত্রী ও গাওয়ার প্রধান মসজিদ, আমবরী, আকিয়াব, কাইউক, নিমাই মসজিদ এবং বুচিদং শহরের টংবাজার দারুল উলূম মাদরাসাসহ বিপুল সংখ্যক মসজিদ-মাদরাসা বিধ্বস্ত ও উচ্ছেদ সাধন করা হয়। সেই সাথে ১৯৭৬ সালে কাইউক পাইউ শহরের মাদরাসাকে ভস্মীভূত করা হয়।[৬৩]

---

৫৮. Ibid.
৫৯. A History of Arakan, p. 155.
৬০. মুহম্মদ ইউনুছ, অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস (আরাকানঃ আর, এস, ও, ১৯৯০) পৃঃ ২৬-২৭।
৬১. New Straits Times, 11 November, 1992.
৬২. অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস, পৃঃ ২৬-২৮।
৬৩. তদেব, পৃঃ ২৮-২৯; মুহাম্মদ আবুল হোসেন মাহমুদ, বার্মায় মুসলিম গণহত্যা (ঢাকাঃ বর্মী মুসলিম কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটি, ১৯৭৮), পৃঃ ৫০।

www.WaytoJannah.Com

আকিয়াবের পাইকতালী ও আকিয়াব জামে মসজিদের ওয়াকফ ভূমিসহ অনেক ওয়াক্‌ফকৃত জমি, মংডু টাউনের কবরস্থান, মংডুর গ্যাকুরা গ্রামের কবরস্থান ও কাইউক পাইক শহরের কবরস্থান সহ অনেক কবরস্থানকে শুকুরের চারণভূমি এবং গণপায়খানা বানানো হয়।[৬৪] পবিত্র কুরআন মাজীদ ও ধর্মীয় বই-পুস্তকগুলিকে প্রায়ই নষ্ট করে ফেলা হয় এবং প্যাকিং সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।[৬৫] কোরবানীর ক্ষেত্রে নানা রকম বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দুই থেকে পাঁচ হাযার লোক অধ্যুষিত গ্রামে দু'টি খাসি অথবা ১টি দু'টি গরু কোরবানীর অনুমতি দেওয়া হয়।[৬৬] ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কোন মুসলমানকেই হজ্জে গমনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। স্কুল-কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার কোন সুযোগ নেই।[৬৭]

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন বড় ধরনের অপারেশন ছাড়াই সংঘটিত 'Rohngya Petriotic Front' প্রদত্ত তথ্যানুসারে ১৯৫৫-৭৮ সাল পর্যন্ত তেইশ বছরের মধ্যে প্রায় ত্রিশ হাযার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বর্মীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।[৬৮]

১৯৭৮ সালের King Dragon অপারেশনে বাংলাদেশে আশ্রিত শরণার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ধারণা করা হ'লেও মূলতঃ এ সংখ্যা আরও বেশী ছিল। 'বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি'র পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ২,২২,৫৩৫ জন জানা যায়।[৬৯] তবে শিবিরের তালিকাভুক্ত রোহিঙ্গা ছাড়াও অনেকেই এলোমেলোভাবে শিবিরের তালিকার বাইরে ছিল এবং তারা পরবর্তীতে এদেশেই রয়ে গেছে। সব মিলে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ৩ লাখেরও বেশী।[৭০]

১৯৪৮-৭৮ সাল পর্যন্ত আরাকানে বর্মী শাসনের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুল মাবুদ খান মন্তব্য করেন- '১৯৪৮-৭৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর বর্মী শাসকশ্রেণী এই দেশটির (আরাকান রাজ্যের) উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেনি। শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরাকান এখনো মধ্যযুগীয় অবস্থায় রয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত আরাকানে মাত্র সতেরটি হাই স্কুল ও একটি মাত্র ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রয়েছে। আরাকানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও মধ্যযুগীয় অবস্থায় বিদ্যমান। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল পাকা রাস্তা রয়েছে (সড়কটি রাথিডং থেকে বুথিডং পর্যন্ত প্রসারিত)। আরাকানে আজও কোন রেলপথ তৈরী হয়নি। ব্রহ্মদেশের (বার্মা) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হ'ল ধান। আরাকান তার সিংহভাগ সরবরাহ করা সত্ত্বেও সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি। আরাকানে আজও কোন ছোট-খাট কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোকের জন্য আরাকানে দু'শ ষাট শয্যা বিশিষ্ট মাত্র তিনটি হাসপাতাল রয়েছে। উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্মী শাসন আরাকানীদের নিকট বরাবরই মনে হয়েছে বিদেশী শাসন। হত্যা, গৃহযুদ্ধ, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ও অরাজকতা আরাকানীদের নিত্যসহচর।[৭১]

উপসংহারঃ

১৯৪২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও আজও আরাকানে রোহিঙ্গা নির্যাতনের কোন অবসান হয়নি। পক্ষান্তরে মিয়ানমার সরকার বিবৃতি প্রদান করেছে যে, ঐতিহাসিকভাবে আরাকানে কখনো রোহিঙ্গা নামে কোন জাতিগোষ্ঠী ছিল না। রোহিঙ্গা নামটি আরাকান রাজ্যের একদল বিদ্রোহীর দেওয়া। ১৭৮৪ সালের প্রথম এ্যাংলো-বর্মী যুদ্ধের পর থেকে প্রতিবেশী বাংলার মুসলমানরা বেআইনীভাবে আরাকানসহ বার্মায় প্রবেশ করে।[৭২] বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় মিয়ানমার সরকারের এ বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।[৭৩] মূলতঃ রোহিঙ্গাদের অভিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের স্বদেশ থেকে উচ্ছেদ করার পিছনে আরাকানে মুসলিম জাতিসত্তার বিনাশ সাধনই তাদের মূল লক্ষ্য।[৭৪] ১৯৪২ সালের পর থেকে আরাকান হ'তে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরাই বিভিন্ন সময়ে বাংলা থেকে স্বদেশে ফিরে গেছে। কিন্তু তারা তাদের পৈতৃক বসতভিটাতে প্রত্যাবাসিত হ'তে পারেনি। মিয়ানমার সরকার তাদেরকে অভিবাসী হিসাবে প্রমাণ করার মধ্য দিয়ে সমস্ত রোহিঙ্গা মুসলমানকে এ অজুহাতে নির্যাতন করছে; যা অত্যন্ত অমানবিক এবং মানবাধিকারের চরম লংঘন। তাই অতিসত্তর শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত রোহিঙ্গাসহ সকল উদ্বাস্তুকে তাদের স্বদেশের পৈতৃক বসতভিটাতে প্রত্যাবাসন, মিয়ানমার সরকারকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধকরণের জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহযোগিতা আরো জোরদার করা দরকার এবং বাংলাদেশ সরকারকে এক্ষেত্রে আরো বেশী তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

---

৬৪. *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস, পৃঃ ২৯।*
৬৫. *তদেব।*
৬৬. *আবুল হোসেন মাহমুদ, বার্মায় মুসলিম গণহত্যা, পৃঃ ৫০।*
৬৭. *বার্মার মুসলমান, মুহাম্মদ রুহুল আমিন অনূদিত, পৃঃ ২১৭।*
৬৮. *Genocide in Burma Against The Muslim of Arakan, published by Rohingya Patriotic Front, Arakan, Burma, pp. 2-7.*
৬৯. *Headquarters of 1978 Rohingya Refugee Control Room in Ukiya, Bangladesh, উল্লেখ্য, N. Kamal, Bangladesh Red Cross Society 1978 as quoted in: Kamaluddin, 1983, p. 146.*
৭০. *দৈনিক আজাদ ও দৈনিক কিষাণ, সম্পাদকীয় ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১।*
৭১. *আবদুল মাবুদ খান, আরাকানে মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১০০।*
৭২. *দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ মার্চ, ১৯৯২।*
৭৩. *বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ও ২২ মার্চ, ১৯৯২।*
৭৪. *রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, রোহিঙ্গা সমস্যাঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, ১৯৭৮-১৯৯৪, অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-২০০১।*

www.WaytoJannah.Com